*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 153 – 160*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন

দিলরুবা খাতুন
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kdilruba91s@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

## Keyword
অন্ত্যজ শ্রেনী, আর্থসামাজিক অবস্থান, নিপীড়ন, বঞ্চনা, নিম্নবর্গের মানুষ।

## Abstract
বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরুর প্রথম লগ্ন থেকেই পুরুষ লেখকদের একাধিপত্য বজায় ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুই বা তিন এর দশকে অনেক নারী ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হন সদর্পে। যদিও উনবিংশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের জেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে বিকশিত করেছিলেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন।বিংশ শতকে এসে আমরা অনেক নারী ঔপন্যাসিক পেলাম, যারা বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু তাদের লেখনীতে উঠে এসেছে বাঙালি পরিবারের অন্দরমহলের মর্মকথা। এই প্রথার প্রথম বৈচিত্র্য আনলেন আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর হাত ধরেই নারীরা প্রথম অন্দরমহলের গণ্ডি অতিক্রম করলেন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বাইরে প্রথম বৈচিত্র্য আনলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি দেখালেন সমকালীন সমাজসঙ্কট ও যুগপ্রভাব একজন সচেতন লেখক কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেনা। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা বললেই আমাদের মনে এক সংগ্রামী কথাকারের মুখ ভেসে ওঠে। একজন সমাজতত্তিকের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখেছেন মহাশ্বেতা দেবী। সমাজের কোনদিক তাঁর লেখনীর বাইরে যায়নি।

## Discussion
মহাশ্বেতা দেবী (জন্ম - ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬, ঢাকা ও মৃত্যু- ২৮ জুলাই, ২০১৬, কলকাতা) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগঢ় রাজ্যের আদিবাসী উপজাতিগুলির অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। লেখকের অনেক লেখা/বই/সাহিত্যকর্ম বিদেশি (যেমন- ইংরেজি, জার্মান, জাপানি, ফরাসি এবং ইতালীয়) ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় (যেমন- হিন্দি, অসমীয়া, তেলেগু, গুজরাটি, মারাঠি, মালয়লামি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া এবং

আদিবাসী হো ভাষা) অনুবাদ করা হয়েছে। কারণ তাঁর বেশিরভাগ লেখাই পাঠক ও সাধারণ শ্রেণির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর কথা হচ্ছে যে,

> "আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যিকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি।"[১]

প্রথম জীবনে সাংবাদিকতার পাশাপাশি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি সমালোচনা করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখনী ধরেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখা হাজার চুরাশির মা, তিতুমীর, অরণ্যের অধিকার অবিস্মরণীয় রচনা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত। তাঁর লেখা উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে 'রুদালি'-র মত কালজয়ী সিনেমা। পরবর্তীকালে তিনি বামপন্থী রাজনীতির আন্দোলনের ধারা থেকে সরে আসেন, রাজ্য-রাজনীতিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তাঁকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী সাংবাদিক ও সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর প্রসারিত কথাসাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অপৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী লেখার উপাদানগুলো সংগ্রহ করেছেন সমাজের সবহারানোদের মাঝ থেকে; দলিত-নিম্নশ্রেণির লোকের কাছ থেকে। আজীবন কাজ করেছেন এদের নিয়ে, পড়াশুনাও করেছেন। তাইতো এসব শ্রেণি নিয়ে তাঁর গর্ব। সগৌরবে বলতে পারেন-

> "...আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলেই তাদেরই হাতে লেখা।"[২]

মহাশ্বেতা দেবী বহুবার ভারতের উপজাতি মানুষদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের জুন মাসে মহাশ্বেতা দেবীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ড সরকার বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার একটি মূর্তিকে শৃঙ্খলামুক্ত করে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শাসনকালে গৃহীত শৃঙ্খলিত বিরসা মুন্ডার একটি আলোকচিত্রের ভিত্তিতে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। বিরসা মুন্ডার জীবনকাহিনি অবলম্বনে ১৯৭৭ সালে মহাশ্বেতা দেবী অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন।

লেখক গল্প ও উপন্যাসে নিচ শ্রেণির কথাই তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন বক্তব্যেও তাই করেছেন। তাঁর ছিল অকৃত্রিম দেশপ্রেম। নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা না করে লিখেছেন সাধারণের নিয়ে। ২০০৬ সালে ফ্রাঙ্কফুট বইমেলায় ভারত দ্বিতীয় বারের জন্য অতিথি দেশ নির্বাচিত হয়। মেলার উদ্বোধনী ভাষণে মহাশ্বেতা দেবী রাজ কাপুরের বিখ্যাত চিত্রগীতি 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি' থেকে পংক্তি উদ্ধৃত করে একটি আবেগময় ভাষণ দেন –

> "সত্যই এটি এমন এক যুগ যেখানে 'জুতা'টি (জুতো) জাপানি, 'পাতলুন'টি (প্যান্ট) 'ইংলিশস্তানি' (ব্রিটিশ), টোপি'টি (টুপি) 'রুসি'(রাশিয়ান), কিন্তু 'দিল'... দিল'টি (হৃদয়) সর্বদা 'হিন্দুস্তানি' (ভারতীয়) ... আমার দেশ, ক্ষয়প্রাপ্ত, ছিন্নভিন্ন, গর্বিত, সুন্দর, উষ্ণ, আর্দ্র, শীতল, ধূলিধূসরিত, উজ্জ্বল ভারত। আমার দেশ।'[৩]

দলিতদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হয় না কখনও। তারা আড়ালেই থেকে যায়। বাঙালি ইতিহাসেও তাই। আমরা অন্যদেশের শাসকদের নিয়ে ইতিহাস লিখি, জয়গান করি। কিন্তু আজীবন যারা দেশের জন্য, এখানকার যারা আদিবাসি তাদের নিয়ে কয়টা লেখা হয়? কয়জন স্বীকৃতি পান? কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন এদের নিয়ে, আন্দোলন করেছেন দলিতদের অধিকার নিয়ে, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ব্যক্তিগতভাবেও লিখেছেন। একদিন মুণ্ডা কিশোরী মহাশ্বেতা দেবীকে প্রশ্ন করেছিল- আদিবাসীদের কি কোনো নায়ক নেই? এ প্রশ্ন সম্ভবত তাঁর সারাটা জীবন তাড়িত করেছে। হয়তো সেই তাড়নায় বাংলা সাহিত্যকে তিনি ভিন্ন জীবনের আখ্যানে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। সাহিত্য রচনার

পাশাপাশি ওইসব মুণ্ডারীর আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন শবরদের মাতা। সাঁওতালদের মারাংদাই (বড়দিদি)। ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া গোষ্ঠীর মানুষের জীবনকে উপজীব্য করে উপন্যাস-গল্প রচনা করেছেন একের পর এক।

বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁরা একসঙ্গে থাকতে পারেননি পরিস্থিতির চাপে। শেষমেশ অপমানিত ও হতাশ চুনী ১৯৯২ সালে আত্মহত্যা করে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী ব্যাধখণ্ড লিখে সামাজিক বার্তা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই লেখক লিখলেন ‘রুদালী’, রাজস্থানের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীকে নিয়ে, অর্থের বিনিময়ে মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করে যারা। এই ‘রুদালী’ গল্পের নায়িকা শনিচরী, কলেরায় স্বামীর মৃত্যুতে অসহায়, স্বামীর জন্যে তার কাঁদা হয়নি, শাশুড়ির মৃত্যুর পরেও সে কাঁদেনি। কিন্তু তাঁকে অর্থ রোজগারের জন্যে এবাড়ি-সেবাড়িতে গিয়ে মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে হয়েছে। কান্নার রকমফেরে মজুরি ধার্য হয় যে সমাজে সেখানে শনিচরীরা তার স্বামী বা প্রিয়জনের জন্যে কীভাবেই বা কাঁদবে! লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেমন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি একথাও ঠিক, তিনি তাঁর উপলব্ধ সমস্যার সমাধান করারও চেষ্টা করেছেন প্রতি মুহূর্তে। তাঁর সমাজসেবী সত্তা তাঁর সৃজনীশক্তিকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি কখনও। তাঁর ছোট গল্প ‘বাঁয়েন’-এ ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র এঁকেছেন, যেখানে নায়িকা চণ্ডী জাতিতে ডোম। চণ্ডীর বাবা ভাগাড়ের কাজ করত, অর্থাৎ কারও মৃত্যু হলে তার জন্যে গর্ত খুঁড়ে দিত। চণ্ডী তার বাবার মৃত্যুর পর সেই কাজ আরম্ভ করে। শবদেহ সৎকারের সূত্র ধরেই ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মলিন্দরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ে হয়। তাদের পুত্র ভগীরথের কখনও মনে হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কখনও কারও মা হতে পারে, দূর থেকে দেখেছে মাথায় লাল কাপড়ের ধ্বজা, উদভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের দুপুরে কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর। ডোমদের মধ্যে একটি প্রচলিত সংস্কার ছিল, বাঁয়েন যদি কোনও ছোট ছেলে বা পুরুষকে দেখে, তখনই তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার চণ্ডীকে স্বামী সংসার সন্তান থেকে সরে যেতে হয়, এমনকী নিজের স্বামী সন্তানের পরিচয় দেওয়াও নিষেধ ছিল। পুত্র ভগীরথ জানতেও পারে না তার মাতৃপরিচয়। সেই পরিচয় যখন উদ্ঘাটিত হয়, ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই চণ্ডী বাঁয়েন যখন নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মানুষজনকে রক্ষা করে, তখন সেই সমাজই তাকে, সেই বিসর্জিত চণ্ডীকে তার আসল পরিচয় ফিরিয়ে দেয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে চণ্ডী তখন তাদেরই একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এখানে নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ সমাজের অত্যাচার ও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়েই লেখকের সমাজ-সচেতন মন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।মহাশ্বেতা দেবীর গল্প ‘ধৌলি’তে এক আদিবাসী নারীর সঙ্কটময় জীবনকাহিনি অন্য মাত্রা অর্জন করেছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার সকরুণ চিত্র স্পষ্ট সেখানে। ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এলাকার ধৌলির স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাসুরের নজর এড়াতে সে চলে আসে তার মায়ের কাছে। সেখানে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ মিশ্রিলালের প্রতি তার ভালোবাসা এবং গর্ভবতী হওয়া, তারপর মিশ্রিলালের মায়ের থেকে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে স্বীকৃতি না পেয়ে, সর্বোপরি মিশ্রিলালের থেকে প্রত্যাখাত হয়ে একসময় সে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই ধরনের পথ নারীকে অবলম্বন করানোর জন্যে যে মিশ্রিলালরা দায়ী থাকেন, সেকথা সমাজে কখনওই বিবেচিত হয় না। সেই বাস্তব ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তাঁর কলমে। মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি শক্তিশালী গল্প ‘দ্রৌপদী’তে সভ্য সমাজের আদিবাসীদের প্রতি শোষণ এবং সেই শোষণের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্পে দ্রৌপদী নামক আদিবাসী নারী-চরিত্রে উলঙ্গ ও সোচ্চার প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর শাণিত উচ্চারণে। চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলে বলে, ‘হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করবো কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি?’ মহাশ্বেতা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> “শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করা যায়, লালসা চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু সম্মান দেওয়া যায় না। অথচ এই গল্পের শেষে সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে। এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক, কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য সম্মান।”[৪]

সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই লক্ষ্যেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কাজ করে গেছেন। তাঁর সৃষ্ট নারীরা যেমন শোষিত হয়েছে, ঠিক সেরকমই বুদ্ধিতে, সাহসে, সরব ও নীরব প্রতিবাদে স্বতন্ত্র হয়ে যাতে সমাজে বার্তা দিতে পারে, সেইদিকেই লেখকের দৃষ্টি ছিল। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রদের মধ্যে সেই চেতনা লক্ষ্যণীয়

মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদী জীবন ও সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ঘরাণার লেখক। তাঁর লেখায় বহুমাত্রিক অনুষঙ্গে দেশজ আখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি একজন অনুসন্ধানী লেখক। তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়কদেরকে তুলে এনেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গের জ্বলন্ত উদাহরণ তাঁর লেখা'অরণ্যের অধিকার', 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর', 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাস। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের ভুমিকায় তিনি বলেছেন, — লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায় দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসা কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।স্বাধনী ভারতে বসবাস করে পরাধীন ভারতের ইতিহাস লিখেছেন বীরসার উলগুলনের তাৎপর্যময় ব্যাখ্যা করে। তিনি দেখতে পান স্বাধীন ভারতেও মুন্ডারা ভূমিহীন তাই তিনি ইতিহাসের মাঝ দিয়ে তাদের দিয়ে জাগাতে চান।

তিনি বীরসার কথা সবাইকে জানাতে চান। অরণ্যের অধিবাসীদের বেঁচে থাকার লড়াইকে তিনি 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি ইতিহাসের আলোকে অরণ্যের আদিবাসী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত বর্তমান প্রজন্মের মানুষদেরকে শুনিয়েছেন গভীর মমতায়। মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের আদিবাসী বীরকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি মুন্ডা জনগোষ্ঠী থেকে তাঁর উপন্যাসের নায়ক বীরসাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের বীরের কাতারে এনে তাকে দাঁড় করিয়ে শ্রেণি সংগ্রামের বীজকে ছড়িয়ে দেন। মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র বীরের কাহিনি বীরসা চরিত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিক তাঁর উপন্যাসগুলোতে তিনি আরো আরো চরিত্র এঁকেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' এর চোট্টি একজন তীরন্দাজ, সে বীর। সুরজ গাগরাই এর সুরজ চরিত্রটিতেও আমরা বীরের উপস্থিতি দেখতে পাই।প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মহাশ্বেতা দেবী বীরসা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসের পটভূমিকায়, ঠিক তেমনি ভাবে 'সুরজ গাগরাই' উপন্যাসের চরিত্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রও তিনি ইতিহাসের সত্যি ঘটনাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী নিজেই বলেছেন, সুরজ গাগরাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সুবর্ণরেখা নদী প্রকল্প সত্যি, ব্যাপক আদিবাসী মালিকানা জমি অধিগ্রহণ সত্যি। ওই বড়ো প্রকল্পের অঙ্গ খড়কাই নদী বাঁধ প্রকল্প। খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষ সত্যি, তা ১৯৮২/১৯৮৩ তে ঘটে। ওই সংঘর্ষের নেতা ছিলেন, চাইবাসার কাছাকাছি ইলিয়াড নিবাসী গঙ্গারাম কালুরিয়া। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। শর্ট সার্ভিস কমিশন এর পর ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। তাঁর কথা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়, ১৯৮২-৮৩ তে ঘটে যাওয়া সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পবিরোধী নেতা গঙ্গারাম কালুরিয়া মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের নায়ক হয়ে যান সুরজ গাগরাই নামে।

মহাশ্বেতা দেবী শুধু বীরসা মুন্ডা আর সুরজ গাগরাই চরিত্রই নয়, তাঁর 'ক্ষুধা' উপন্যাসটির চরিত্র নিমার্ণের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া সত্যি ঘটনা থেকে চরিত্র নিতে দেখা যায়। তিনি ক্ষুধা উপন্যাস লেখা প্রসঙ্গে বলেন, 'আশির দশকে বিহারের তরুণ সাংবাদিকরা 'মানাতুর মানুষ খেকো' লিখে পাঠক ও প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দেয়। মানাতুর জমিদার (নামটা লিখব না) মৌয়ার সিং তাঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানার খাঁচা বন্দি চিতাবাঘকে তাঁর বনডেড লেবার বা ভূমিদাসদের মাংস মাঝে মাঝে খাওয়াতেন। —ঘটনা সত্যি। একটি নতুন মা ও তার শিশুকে বাঘের খাঁচায় ছুড়ে ফেলার ঘটনা যে সত্যি তা মালিকেরা বা ভূমিদাসরাই বলে।... ডালটনগঞ্জে যে সাংবাদিকের ঘরে থাকতাম সে ঘর, ওই শিবাজী ময়দান, গান্ধী হলো, পালামৌয়ের পথঘাট, সেদিনের তরুণ বুদ্ধিজীবী-সহ সাথিরা জানে 'ক্ষুধা'র প্রতিটি অক্ষর সত্যি।

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আদিবাসী মানুষ। আদিবাসীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু এক জন লেখকের কলমে এতখানি লেখা আগে মেলেনি। তা ছাড়া, আগের লেখার কথা ও কথনরীতি মহাশ্বেতা দেবীতে অনেকখানি বদলে যায়। সে বদলের উৎস গত শতাব্দীর ষাটের দশকের নানা আন্দোলন,

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-18*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 153-160*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল আদিবাসী অঞ্চল। মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী যোগের সূত্রপাত ওই সময়ে। তা নিবিড়তর হয় আট-দশ বছরে। তার প্রথম ফল ১৯৭৫-এ একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত অরণ্যের অধিকার। সেই অধিকারের প্রশ্ন তারপর তাঁর লেখায় উচ্চারিত হতে থাকে নানা ভাবে এবং নানা প্রেক্ষিতে। ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয় হুলমাহা ও শালগিরার ডাকে। অরণ্যের অধিকার-কে জুড়লে দেশের একটি বিস্তৃত অংশের আদিবাসী জীবনকথা ধরা থাকে ওই উপন্যাসত্রয়ীতে।

একই সময়ে অন্য এক ইতিহাসের সন্ধান করছিলেন সমাজ-অর্থনীতি-ইতিহাসের কিছু বিশিষ্টজন। তাঁরা প্রচলিত অধিপতি-সেনাপতি বৃত্ত ছেড়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসের রূপরেখা রচনা করতে চাইছিলেন। তার একটি পর্যায়ে, ১৯৮৮-তে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রশ্ন তোলেন, 'ক্যান দ্য সাবলটার্ন স্পিক? কথাটির মধ্যে নানা রাজনৈতিক-সামাজিক মাত্রা ছিল। ইঙ্গিত ছিল নিম্নবর্গের কথা বলে যা শুনি তা সত্যিই তাদের কথা কি না। বিষয়টি জটিল, কারণ আদালতের বিক্রয়নামা যদিও বিক্রেতার নামে লেখা, কিন্তু তা দলিল-লেখকের ভাষা ও ভাষ্য সরকারি দস্তুরে। রাজনৈতিক দলিল দলের নামে লেখা হলেও তা দলনেতার কণ্ঠ। বিষয় ও বিষয়ী, লেখা ও লেখকের সম্পর্কের সত্যতাও নিম্নবর্গীয় তত্ত্বের সূত্র ধরে সাহিত্যপাঠে এসে পড়ে। সাহিত্যগত যে আলোচনা, তার কেন্দ্রবিন্দুতে মহাশ্বেতা দেবী চলে আসতে থাকেন ভারত জুড়ে। তার বিস্তৃতি এক সময়ে বৃহত্তর জগতেও। নিছক ভক্তি নয়, জ্ঞান ও কর্মকে তিনি তাঁর আদিবাসী চর্চা ও চর্যায় যুক্ত করেন। নিজেকে বদলান এবং বদলের চালিকাশক্তিও হয়ে ওঠেন। তাই তাঁকে নিয়ে, তাঁর সৃজনকে নিয়ে নতুন নতুন পাঠ।বইটির প্রথম আলোচ্য 'ইতিহাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠ' এবং সে আলোচনা অরণ্যের অধিকার, হুলমাহা ও শালগিরার ডাকে উপন্যাস তিনটি নিয়ে। প্রথম উপন্যাসটিতে সারা উনিশ শতক জুড়ে মুন্ডাদের অরণ্যভূমি হারানোর ইতিহাস। শুরু আরও আগে, বিরসার ঠাকুরদার জন্মাবার কালে। ১৮৫৫ সালে ধানী মুন্ডা যোগ দেন সিদু-কানুর দলে মুন্ডাদের জমি রক্ষা করতে। তার চার দশক পরে বিরসা অরণ্যের অধিকার চান। সাঁওতালদের 'হুল' নয়, সর্দারদের 'মুল্‌কই লড়াই' নয়, তিনি ডাক দেন 'উল্‌গুলান'-এর, এক মহাবিপ্লবের। তার বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়ায় দিখুদের দল, পুলিশ এবং চার্চও। ১৯০০-তে ধরা পড়েন বিরসা এবং ফাঁসি হয় কয়েক মাস পরে। কিন্তু মুন্ডাদের অবদমিত স্বরে ততদিনে অধিকারের ধ্বনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। তাঁদের গানে, গল্পে, নতুন উপমায় গাঁথাও হয়েছে এই 'উল্‌গুলান'-এর কথা। মহাশ্বেতা দেবী এই বিকল্প ইতিহাসের মানুষজনকে খুঁজছিলেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজের অগ্নিময় সময় হয়তো তাঁকে খুঁজিয়ে নিচ্ছিল।

হুলমাহা-ও আর এক বিদ্রোহের ইতিহাস। জমিদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব এবং কোম্পানি সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিল সেটা সাঁওতাল অভ্যুত্থান। বিস্তার পেয়েছিল দামিন, বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, মানভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে। বিদ্রোহের নায়ক কানু মুর্মুর ফাঁসি হয় ১৮৫৬-তে। মৃত্যুর আগে হুলমাহা-তে কানুর একটি কথা আছে — 'আমি আবার আসব।' ইতিহাসের অংশ হয়েও এই উচ্চারণ কিন্তু অতীত নয়।

শালগিরার ডাকে আরও খানিক পিছনের কাহিনি, ১৭৫০-এর। সেই বছরই জন্ম হয়েছিল তিলকা মুর্মু-র। তিলকার বয়স তখন পনেরো, কোম্পানির হাতে আসে বিহার-ওড়িশার ভার। তখন থেকেই তসিলদার-গোলদারদের শেকড়বাকড় ছড়ায় দূর-দূরান্তে। ১৭৭২-এ রাজস্ব আদায়ের শুরু এবং বিদ্রোহ নানা আদিবাসী অঞ্চলে। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিলকা মুর্মু। তারপর কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে নানান জায়গায় সংঘর্ষের পর আহত তিলকা বন্দি হন এবং তাঁর ফাঁসি হয় ১৭৮৫-তে। সনাতন তাঁর আলোচনায় দেখান, ঠাকুমার গল্পে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত শুনেছিলেন তিলকা। বাবার কথায় জেনেছিলেন সাঁওতাল জাতির ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধন এবং কৌমের মানুষজনের নৈকট্যের কথা। এই ইতিহাস তাঁর মধ্যে স্বপ্নের জন্ম দেয়। সে স্বপ্ন বাঁচার ও বাঁচানোর। তারই প্রতিষ্ঠা মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাসে। আবার তিলকা, কানু ও বিরসার তিন কাহিনির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করেন মহাশ্বেতা দেবী। এই জঙ্গম ইতিহাসের বিপরীতে কোম্পানির নির্মিত ইতিহাস বেশ যান্ত্রিক — ফাঁসি, ফাঁসি এবং ফাঁসি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের বাঁচার ইতিহাসের পাশে শাসকের ফাঁসুড়ের ইতিহাস সাজিয়ে দিয়েছেন মহাশ্বেতা। আলোচ্য বইয়ে কোথাও

তা ধরা থাকে।মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আদিবাসী মানুষ। আদিবাসীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু এক জন লেখকের কলমে এতখানি লেখা আগে মেলেনি।

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আদিবাসী মানুষ। আদিবাসীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু এক জন লেখকের কলমে এতখানি লেখা আগে মেলেনি। তা ছাড়া, আগের লেখার কথা ও কথনরীতি মহাশ্বেতা দেবীতে অনেকখানি বদলে যায়। সে বদলের উৎস গত শতাব্দীর ষাটের দশকের নানা আন্দোলন, যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল আদিবাসী অঞ্চল। মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী যোগের সূত্রপাত ওই সময়ে। তা নিবিড়তর হয় আট-দশ বছরে। তার প্রথম ফল ১৯৭৫-এ একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত অরণ্যের অধিকার। সেই অধিকারের প্রশ্ন তারপর তাঁর লেখায় উচ্চারিত হতে থাকে নানা ভাবে এবং নানা প্রেক্ষিতে। ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয় হুলমাহা ও শালগিরার ডাকে। অরণ্যের অধিকার-কে জুড়লে দেশের একটি বিস্তৃত অংশের আদিবাসী জীবনকথা ধরা থাকে ওই উপন্যাসত্রয়ীতে। একই সময়ে অন্য এক ইতিহাসের সন্ধান করছিলেন সমাজ-অর্থনীতি-ইতিহাসের কিছু বিশিষ্টজন। তাঁরা প্রচলিত অধিপতি-সেনাপতি বৃত্ত ছেড়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসের রূপরেখা রচনা করতে চাইছিলেন। তার একটি পর্যায়ে, ১৯৮৮-তে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রশ্ন তোলেন, 'ক্যান দ্য সাবলটার্ন স্পিক'? কথাটির মধ্যে নানা রাজনৈতিক-সামাজিক মাত্রা ছিল। ইঙ্গিত ছিল নিম্নবর্গের কথা বলে যা শুনি তা সত্যিই তাদের কথা কি না। বিষয়টি জটিল, কারণ আদালতের বিক্রয়নামা যদিও বিক্রেতার নামে লেখা, কিন্তু তা দলিল-লেখকের ভাষা ও ভাষ্য সরকারি দস্তুরে। রাজনৈতিক দলিল দলের নামে লেখা হলেও তা দলনেতার কণ্ঠ। বিষয় ও বিষয়ী, লেখা ও লেখকের সম্পর্কের সত্যতাও নিম্নবর্গীয় তত্ত্বের সূত্র ধরে সাহিত্যপাঠে এসে পড়ে। সাহিত্যগত যে আলোচনা, তার কেন্দ্রবিন্দুতে মহাশ্বেতা দেবী চলে আসতে থাকেন ভারত জুড়ে। তার বিস্তৃতি এক সময়ে বৃহত্তর জগতেও। নিছক ভক্তি নয়, জ্ঞান ও কর্মকে তিনি তাঁর আদিবাসী চর্চা ও চর্যায় যুক্ত করেন। নিজেকে বদলান এবং বদলের চালিকাশক্তিও হয়ে ওঠেন। তাই তাঁকে নিয়ে, তাঁর সৃজনকে নিয়ে নতুন নতুন পাঠ। সনাতন ভাওয়ালের দ্য সাবলটার্ন স্পিকস তেমনই একটি পাঠ সাম্প্রতিক সময়ে। বইটির প্রথম আলোচ্য 'ইতিহাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠ' এবং সে আলোচনা অরণ্যের অধিকার, হুলমাহা ও শালগিরার ডাকে উপন্যাস তিনটি নিয়ে। প্রথম উপন্যাসটিতে সারা উনিশ শতক জুড়ে মুন্ডাদের অরণ্যভূমি হারানোর ইতিহাস। শুরু আরও আগে, বিরসার ঠাকুরদার জন্মাবার কালে। ১৮৫৫ সালে ধানী মুন্ডা যোগ দেন সিদু-কানুর দলে মুন্ডাদের জমি রক্ষা করতে। তার চার দশক পরে বিরসা অরণ্যের অধিকার চান। সাঁওতালদের 'হুল' নয়, সর্দারদের 'মুল্‌কই লড়াই' নয়, তিনি ডাক দেন 'উল্‌গুলান'-এর, এক মহাবিপ্লবের। তার বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়ায় দিখুদের দল, পুলিশ এবং চার্চও। ১৯০০-তে ধরা পড়েন বিরসা এবং ফাঁসি হয় কয়েক মাস পরে। কিন্তু মুন্ডাদের অবদমিত স্বরে ততদিনে অধিকারের ধ্বনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। তাঁদের গানে, গল্পে, নতুন উপমায় গাঁথাও হয়েছে এই 'উল্‌গুলান'-এর কথা। মহাশ্বেতা দেবী এই বিকল্প ইতিহাসের মানুষজনকে খুঁজছিলেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজের অগ্নিময় সময় হয়তো তাঁকে খুঁজিয়ে নিচ্ছিল।

হুলমাহা-ও আর এক বিদ্রোহের ইতিহাস। জমিদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব এবং কোম্পানি সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিল সেটা সাঁওতাল অভ্যুত্থান। বিস্তার পেয়েছিল দামিন, বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, মানভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে। বিদ্রোহের নায়ক কানু মুর্মুর ফাঁসি হয় ১৮৫৬-তে। মৃত্যুর আগে হুলমাহা-তে কানুর একটি কথা আছে— আমি আবার আসব। ইতিহাসের অংশ হয়েও এই উচ্চারণ কিন্তু অতীত নয়। শালগিরার ডাকে আরও খানিক পিছনের কাহিনি, ১৭৫০-এর। সেই বছরই জন্ম হয়েছিল তিলকা মুর্মু-র। তিলকার বয়স তখন পনেরো, কোম্পানির হাতে আসে বিহার-ওড়িশার ভার। তখন থেকেই তসিলদার-গোলদারদের শেকড়বাকড় ছড়ায় দূর-দূরান্তে। ১৭৭২-এ রাজস্ব আদায়ের শুরু এবং বিদ্রোহ নানা আদিবাসী অঞ্চলে। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিলকা মুর্মু। তারপর কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে নানান জায়গায় সংঘর্ষের পর আহত তিলকা বন্দি হন এবং তাঁর ফাঁসি হয় ১৭৮৫-তে। সনাতন তাঁর আলোচনায় দেখান, ঠাকুমার গল্পে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত শুনেছিলেন তিলকা। বাবার কথায় জেনেছিলেন সাঁওতাল জাতির ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধন এবং কৌমের মানুষজনের নৈকট্যের কথা। এই ইতিহাস তাঁর মধ্যে স্বপ্নের

জন্ম দেয়। সে স্বপ্ন বাঁচার ও বাঁচানোর। তারই প্রতিষ্ঠা মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাসে। আবার তিলকা, কানু ও বিরসার তিন কাহিনির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করেন মহাশ্বেতা দেবী। এই জঙ্গম ইতিহাসের বিপরীতে কোম্পানির নির্মিত ইতিহাস বেশ যান্ত্রিক – ফাঁসি, ফাঁসি এবং ফাঁসি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের বাঁচার ইতিহাসের পাশে শাসকের ফাঁসুড়ের ইতিহাস সাজিয়ে দিয়েছেন মহাশ্বেতা। আলোচ্য বইয়ে কোথাও তা ধরা থাকে।

চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর (১৯৮০) উপন্যাসটিকে নিম্নবর্গের নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহের স্বর বলে চিহ্নিত করেছেন আলোচক। চোট্টির পূর্বপুরুষ পূর্তি মুন্ডা যেখানে যেতেন, সেখানেই মাটি থেকে অভ্র বা কয়লা বেরত। তাঁরই উত্তরপুরুষ হল চোট্টি, যে নামে একটি নদীও। সব সময়ে ওঁকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে। এও এক ইতিহাসের গড়ন, লিপি নিরপেক্ষ কথার কথা, যা মহাকথার জন্ম দেয়। নির্মিতির সঙ্গে যার যোগ আছে তা হল মহাকাব্যের, এমনকী চোট্টির তিরের সঙ্গে রাম বা অর্জুনের বাণেও মিল। তবে তার ব্যবহার চোট্টিতে গ্রিক মহাকাব্যের ঢালটির মতো। চোট্টি মুন্ডা কোনও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন না, কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত মুন্ডাদের কিছু তির ঠিক লক্ষ্যই ভেদ করে। সেই তিরের পিছনে চোট্টির কথা-মহাকথার যোগও থাকে।

অপারেশন? বসাই টুডু ষাট-সত্তরের কাহিনি এবং সনাতন এটিকে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক কণ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন। বসাই কৃষক আন্দোলন করেছেন কালী সাঁতরার সঙ্গে, পরে মত ও পথ বদলান। বসাই অ্যাকশন-অপারেশনে চলে যান। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল না পাইপগানে, গুলিতে – বাবুদের অস্ত্রে। তাঁর বিশ্বাস তিরে। ইতিহাসের দ্বিধারার উৎস এখানেও। বসাই টুডু নকশাল আন্দোলনের একটি অঞ্চলের অ্যাকশনের নেতা হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাঁর জীবন ও মৃত্যু প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোতে ধরা যায় না। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বসাই চার বার মরেন ও বাঁচেন। তাঁর বাঁচা-মরার থই পায় না পুলিশ, এমনকী বাম রাজনৈতিক দল দু'টিও। বসাই টুডুর সঙ্গে কালী সাঁতরার রাজনৈতিক দলবিভেদ ঘটে সত্তরেই, কিন্তু কালী সাঁতরার ডাক পড়ে বারে বারে বসাইকে চিহ্নিত করতে। দল বিভক্ত হলেও কালী ও বসাইয়ের বর্গে বোধ হয় তেমন পরিবর্তন ঘটে না। বসাইকে কালীর চেনা না-চেনা অন্য এক বর্গের অংশ। তা অনেক প্রাচীন, রাজনৈতিক দলগুলির জন্মের বহু আগের। এই চিহ্নিতকরণের জায়গাটি বইটিতে অন্য এক স্বরের সন্ধান দিয়েছে।

টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা-র পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৮৭-তে। সনাতন এটিকে চিহ্নিত করেছেন নিম্নবর্গের নীরব কণ্ঠ হিসেবে। যে আদিবাসীদের মূল স্রোতের চাপে বারে বারে দেশান্তরী হতে হয়, তাকে ভিটেমাটির সঙ্গে মৃতজনের সমাধিক্ষেত্র থেকে আপন সংস্কৃতির অনেক কিছুই হারাতে হয়। রাজা থেকে প্রজা, প্রজা থেকে দাস, অঋণী থেকে ঋণবদ্ধ, তারপর হরোয়াহি মাহিদার হালি কামিয়া হয়ে ধুলোর মতো উড়ে যাওয়া। পিরথার আদিবাসীও অন্নহীন জলহীন ক্ষইতে থাকে ও মরে, জনসংখ্যা কমে। তখনই আকাশে উড়ে যায় পূর্বপুরুষদের আত্মা – পাখির রূপে। টেরোড্যাকটিলের প্রতীকে আদিবাসীদের অসহায় বিলুপ্তির সংকেত এখানে। নিম্নবর্গের মানুষের কথা হারানোর বৃত্তান্ত।

আরও দু'টি স্বরের কথা আলোচনা করেছেন সনাতন। এর একটি হল নারীকণ্ঠ, অন্যটি অপেক্ষাকৃত স্তিমিত কণ্ঠ। প্রথম অংশে আসে দ্রৌপদী, হুলমাহার মা, শনিচরী ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টিতে সাগোয়ানা ও অন্যান্য লেখা। আদিবাসী নারীদের নানা ভাবে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ব্যবহৃত হওয়ার কাহিনি মহাশ্বেতা দেবীতে। এঁদের অনেককে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, এদের কথা শুনেছেন, নিজের নারী সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন। দিখু, ইটভাটার মালিক, সশস্ত্র বাহিনী, এদের লুণ্ঠন করে। ডাইনি অপবাদেও মারে। তবু কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়। সেনানায়কের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্ষিতা নারী এনকাউন্টারের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ক্ষীণ স্বর তখন ঘন ধ্বনিকে অস্বীকার করে। এ ভাবেই শালগাছ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সেগুন বৃক্ষের।

সনাতন বিনির্মাণ তত্ত্ব, নিম্নবর্গের পাঠক্রম ইত্যাদির সঙ্গে ফরাসি দার্শনিক আল্যাঁ বাদিয়ুর চিন্তাকে তাঁর পাঠে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাদিয়ুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর মেলেও অনেক জায়গায় এবং সে কারণে দর্শনের সূত্র দিয়ে সৃজনের গুরুত্ব বোঝা। অনেক জায়গায় মিলেছে ঠিকই, কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে। সৃজন থেকে তত্ত্বগঠন আর তত্ত্ব দিয়ে সৃজন বোঝার মধ্যে উপার্জন ভিন্ন। কিন্তু সনাতন ভাওয়াল যত্ন ও সততার

সঙ্গে বইটি লিখেছেন। সঙ্গে এটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের কাছে শুধু যাননি, তাদের জন্য দরজাও খুলে রেখেছেন। দরজা বন্ধ থাকলে লেখার সময় নিজের কথা নিম্নবর্গের নামে ঢুকে পড়ে। এমন কত গল্প-উপন্যাসই না লেখা হয়েছে বিগত চার-পাঁচ দশকে! মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এ উপন্যাসের কৌয়ার, তেতরি ভূঁইন ও কসিলা চরিত্রগুলোকে বাস্তব ঘটনার আলোকে চিত্রায়িত করেছেন। ঘটে যাওয়া ঘটনাই এক সময় ইতিহাস হয়ে যায়, আর সেই ইতিহাস থেকে সংগৃহীত চরিত্রগুলো নিয়ে মহাশ্বেতার রচিত উপন্যাস ও আর এক ইতিহাস।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সাহিত্য ও জীবনকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহিত্যে বাস্তব জীবনের শৈলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পসম্মতভাবে। সে আখ্যান অতীতেরও হতে পারে, আবার বর্তমান সময়ের হতে পারে। তিনি লেখক হিসেবে প্রতিবাদী, আবার ব্যক্তি জীবনেও তিনি প্রতিবাদী।

মহাশ্বেতা দেবীর কথা সাহিত্যে যে বাস্তব সমস্যা ফুটে উঠেছে তা বর্তমান সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। সমাজের উচ্চ ও নীচ ভেদাভেদ ও নানা ঘটনা মহাশ্বেতা দেবী কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সমকালীন কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে এই শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাহিনীকে গ্রহণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর কর্মপ্রয়াস কে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অনেক সাহিত্যিক। মহাশ্বেতা দেবী উচ্চ ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে নিঃস্ব জনের হয়ে কলম ধরেছেন, অন্তজ প্রতিবাদী চরিত্র সৃজন করেছেন। তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণীর ঐতিহাসিক দলিল। সাহিত্য চর্চার সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস।

## Reference :

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, পৃ. ৬৯
২. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, পৃ. ৯৪
৩. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, পৃ. ১০৬
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, পৃ. ১৫৭

## Bibliography :

দেবী মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭।
দেবী মহাশ্বেতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা২০১১।
দেবী মহাশ্বেতা, একজীবনে ই, প্রমা, জুলাই ১৯৯৬।
নন্দী, রতনকুমার সম্পাদিত অরণ্যের অধিকার, লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ২০০৫।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, মহাশ্বেতা নানা বর্ণে ও নানা রঙে, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৫ই মে ২০১৫।
সেনগুপ্ত, ঝুমুর, জনবাদী উপন্যাস ও মহাশ্বেতা দেবী, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা ২০০৫।
ঘোষ, নির্মল, মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ১৯৯৮।